mkvmb, evsjv‡`‡ki Av_-mvgvwRK ivR‰bwZK DËiY I ZvRD Ïxb Avng`

†gvnv¤§` Ave`j nvbvb
PZ_ e¨vP, lô †mwg÷vi
†ivj : mm-39
‡gvevBj : 01920938166
B‡gBj : hannan39du@gmail.com
kwš I msNl Aa¨qb wefvM

XvKv wekwe`¨vjq

Rgv`v‡bi ZvwiL: 20 Rb, 2012

mwPcÎ

মুক্তির মিছিলের প্রারম্ভে.....৩

জন্ম, বংশ আর শীতলক্ষ্যা.....৪

সকালের রোদ্দুরে স্বর্ণশিশির.....৪

রাজনীতির মঞ্চ থেকে.....৫

তাজউদ্দীন আহমদ ও আওয়ামী লীগ.....৬

প্রচন্ড ঝড়ের কবল থেকে.....৭

মুক্তির পাঞ্জেরী হয়ে.....৮

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ আর তাজউদ্দীন আহমদ.....৯

নির্জন মর্মস্পর্শী বেদনা.....১৩

তাজউদ্দীন ও তার অর্থনৈতিক দর্শণ.....১৫

সুশাসনের পাতায়.....১৭

ইতিহাসের সাক্ষী.....১৯

তথ্যসূত্রঃ.....২২

gw³i wgwQ‡ji cvi‡¤

কেউ কি কখনো রাতের আকাশে উজ্জ্বল তারকারাজীর মাঝে লুব্ধক কে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন? অনেকেই এ পরম আনন্দ-উপভোগের যাত্রা থেকে নিজেদের এড়ানোর দুঃসাহস হয়ত করেননি, কিন্তু কেন? তারকারা কি আপনাদের এসে প্রস্তাব করেছিল? ইতিহাসের এক অনিবার্য বাস্তবতা মানুষ ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের নির্যাস গ্রহণ করবেই। শান্তিপ্রিয় সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ইতিহাসের কোণ থেকে আকাশের নক্ষত্রতূল্যদের জীবন, সমাজ, চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। এটি একান্তই এক অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক সত্যতা, যাকে ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে না। কারণ ইতিহাসের সৃষ্টি সত্য প্রকাশের জন্যই। কিন্তু রঙ, রস আর আবেগ দিয়ে সাজানো মিথ্যা কাব্য ইতিহাসে টেকসই হয় না। ইতিহাস তাদেরই ফুলেল শুভেচ্ছায় সংবর্ধিত করে, মঞ্চায়িত করে, যারা পৃথিবীতে আকাশের তারকাতূল্য। তারকারা রাতের আকাশে উদিত হয়, আপন আলোয় প্রকাশ করে নিজেদের অপরিসীম মহিমা । আমাদের এই বসুন্ধরায়ও মানুষ রূপী গুটিকয়েক তারকার আভির্ভাব ঘটে বিভিন্ন প্রেক্ষপটে, সময়ের প্রয়োজনে। ইতিহাস এসব ক্ষনজন্মাদের পদচ্ছাপে আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়।

আজকের এই বেলায় এরকম এক উজ্জ্বল উদ্ভাসিত তারকার গল্প শোনাবো। সে নিজে কতোটুকু দীপ্তিমান ছিলো, তা মূল্যায়নের যোগ্যতা আমার নেই- কিন্তু বাঙালি জাতি তার পরাধীনতা আর দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত করার সঠিক সন্ধান পেয়েছিল নির্দ্বিধায়। রক্ত আর প্রতিবন্ধকতার স্বাক্ষরে যে জীবনের ভাষ্য; তাকে বাঙালি জাতি সার্থক করেছিলো রক্তজবার ছোঁয়ায়। আসুন আমরা সেই রক্তজবার গল্পে মেতে উঠি। উজ্জ্বল তারকা আর রক্তজবার সেই গল্পে উনিশ্শো একাত্তর হয়ে উঠবে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। বাঙালি জাতি স্পর্শ করেছিল ন্যায় সঙ্গত, নিরপেক্ষ, শৃঙ্খলাপূর্ণ আর সামাজিক বৈষ্যম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পদচ্ছায়া। বাঙালির একচল্লিশ বছরের কিংবদন্তীতূল্য ইতিহাসে নানা অপ্রাপ্তির মাঝেও যিনি আজও আজকের তরুণদের মাঝে আদর্শ হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

Rb¥, esk Avi kxZj¶¨v

তিনি আর কেউ নন, যিনি বাংলাদেশ নামক ইতিহাসের অন্যতম রচয়িতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার নামের বানান- তাজউদ্দীন আহমদ। এই মহান ব্যক্তি ইতিহাসে ‘বাংলার তাজ’ নামে সমধিক পরিচিতি। তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকার উপকণ্ঠে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গজারি বন ঘেরা দরদরিয়া গ্রামে ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোলবি ইয়াসিন খান আর মাতা মেহেরুন্নেসা খানম। শীতলক্ষ্যার পূর্ণিমা যৌবন আর তীর ছোঁয়ে যাওয়া ঢেউয়ের স্নিগ্ধতায় সত্যিই সেদিন প্রকৃতি এক অপরূপ সৌন্দর্যে সেজেছিল। আজ আর হয়ত সেই শীতলক্ষ্যা নেই, কিন্তু ক্ষনজন্মার পদচ্ছাপে সেবারই শীতলক্ষ্যা ধন্য হয়েছিল। শীতলক্ষ্যা সেই প্রগাঢ় অনুভূতিকে আজও নিবিড় যত্নে ধারণ করে রেখেছে। আজও তাই সেথায় প্রাণ এসে উঁকি দিয়ে যায়, লাজুক আভায় সূর্য কিরণ লুটিয়ে পড়ে। ইতিহাসে কালজয়ী বেশিরভাগ মনীষীদের জীবন এবং নদীর বহমানতার এক নিশ্ছিদ্র সম্পর্কের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। দিনের শেষে কর্মব্যস্ত মন নদীর স্নিগ্ধতা, ঘন বাতাস আর জোয়ারের গর্জন সত্যিই দেহ, মনকে স্থির ও দৃঢ় করত, নিয়ে যেতে নতুন কোন চিন্তার রাজ্যে। যা আগামী দিনের সাহসী আর দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা সাজাতে সাহায্য করত। ধন্য শীতলক্ষ্যা ধন্য; তোমারই জন্যে........................ ।

mKv‡ji †ivÏ‡i ¯Ywkwki

চার ভাই, ছয় বোনের মাঝে চতুর্থ তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষার হাতেখড়ি বাবার নিকট আরবি শিক্ষার মাধ্যমে। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব রকমের মেধাবী ছিলেন। পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি সমগ্র ঢাকা জেলায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। এস, এস, সি ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বাদশতম ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। স্কাউট আন্দোলনের সাথে সংযুক্তি পরবর্তী কর্মজীবনের শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সামনে থেকে স্বজাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার শক্তি, সাহস সঞ্চার করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন-

‘স্কাউট হিসেবে শিক্ষা, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে অমানষিক পরিশ্রম করতে প্রেরণা ও ক্ষমতা জুগিয়েছে”। এসময় তিনি মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এবং পরে আইনে।

iwRbxwZi gÂ †_‡K

জনাব তাজউদ্দীনের চিন্তা ধারায় রাজনীতির বীজ রোপিত হয়েছিল সেই গজারি বন ঘেরা শীতলক্ষ্যা বেষ্টিত কাপাসিয়াতেই। তিনি তখন কাপাসিয়া মাইনর স্কুলের শিক্ষার্থী। সেই সময় কাপাসিয়াতে বৃটিশদের একটি বন্দী ক্যাম্প ছিল। সেখানে নির্বাসিত হয়েছিলেন কলকাতায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের তিন বিপ্লবী রাজেন্দ্র নারায়ন চক্রবর্তী, বিরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনীন্দ্র শ্রীমানী। তার স্কুল সহচর আবদুস্ সামাদের বর্ণনায়-মূলত এই তিন বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেই তিনি দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাবার প্রেরণা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে প্রায় অর্ধশত বই পড়ে পেলেন। তিনি পেয়েছেন শোষন, বঞ্চনাহীন সমাজ আর অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক দীক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজনীতি। কেননা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা। আর এখানকার ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন আদর্শ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সকল শাখায় ছিল তার দীপ্ত পদচারনা।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। শুধুমাত্র স্বাধিকার আন্দোলন নয় ভাষা আন্দোলনেও ছিল তার স্বক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে যে পাঁচজন ছাত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে দেখা করেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। মূলত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক ছিল বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত যুবকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উন্মেষ যুগ। এসময় মুসলিম লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম খান যুবকদের দলে ভিড়াতে রাজনীতিতে “ইসলামিক সমাজতন্ত্র” নামক প্রপাগান্ডার আশ্রয় নেন। কিন্তু শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা অচিরেই বুঝতে সমর্থ হয় মুসলীম লীগ হল

নওয়াবজাদাদের দল তাদের প্রগতিশীল, গঠনমূলক আর মধ্যবিত্তের আশা-আকাংখার প্রতিফলন এই দলের দ্বারা অর্জিত হবে না। তারা সহজেই এদলের গুরুদর্শন, অন্তঃসারশূন্যতা আর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা উপলব্ধি করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত "আওয়ামী মুসলিম লীগ" গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি। দলে দলে বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলিম যুবকেরা এই দলের ছায়া তলে যোগ দান করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পরবর্তীতে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট কাঠামোটিতে বাঙালি জাতির পরিপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়।

১৯৫৩ সাল। ঠিক তখনই তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। সে বছরই তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। রাজনৈতিক কর্মকান্ড আর যোগ্য নেতৃত্বগুনে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের খুব কাছাকাছি চলে আসেন। গড়ে উঠে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, অনেকটা মানিকজোড়ের ন্যায়। ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অবিস্মরণীয়ভাবে বিজয় লাভ করে। এ নির্বাচনে তাজউদ্দীন আহমদ মাত্র ২৯ বছর বয়সে প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের অভিবক্ত বাংলার সাধারণ সম্পাদক প্রধান নেতা ফকির আবদুল মান্নানকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয় দেন এবং পরিষদের কনিষ্ঠতম সদস্য হবার গৌরব অর্জন করেন।

ZvRDÏxb Avng` I AvIqvgx jxM

ক্ষমতালোভী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আর উচ্চাকাংখী জেনারেলরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খুব বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে দেয় নি। তারা রাজনীতিতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জন্ম দেয়। ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। দেশে সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং

রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দল গুলোর এই চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে ষাটের দশকের মধ্যভাগে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার এক সাহসী পদক্ষেপ আর সঠিক কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। যার যোগ্য সহচর হিসেবে সর্বদা ছায়ার মত পাশে অবস্থান করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। জেনারেল আইয়ুবের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) স্বায়ত্তসাসন আন্দোলনে অগ্রপথিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন দলের অবিসংবাদিত নেতা। পূর্ববাংলার সর্বস্তরের মানুষ ক্রমেই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করছিল আর আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের আশা আকাংখার একমাত্র অবলম্বন। রাজনীতির এ পুনরুজ্জীবন ও অগ্রগামিতার আন্দোলনে, বলিষ্ঠ নেতৃত্বগুনে তাজউদ্দীন আহমদ ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকেন ভবিষ্যতের দৃপ্ত সারথি। কিন্তু মুক্তিকামী জনতার রাজনৈতিক উত্তরণকে অস্ত্র হাতে দন্ডায়মান সান্ত্রী কাপুরুষদের সহ্য হয় নি। ১৯৬২ সালে গ্রেফতার হন তাজউদ্দীন আহমদ।

cPÛ S‡oi Kej ‡_‡K

প্রবল ঝড়বৃষ্টি, বাতাসের প্রবল প্রবাহ আর ভীষণ বিপদ-আপদের গ্রাসে পরিব্যাপ্ত পাখির ছানা যেমন করে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ডাল-পালার নিচে কোন মতে জীবন বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি বাঙালি জাতি বুনো হন্তারকদের নিকট থেকে নিজেদের স্বর্ণশ্যাম রক্ষার আশায় উদগ্রীব। তেমনি বাঙালি জাতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে কয়েকজন পাঞ্জাবী শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের বঞ্চনার শিকার। যা আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে গণদাবীতে পরিণত করে। যার সিংহভাগ নেতৃত্বে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। প্রতিভা আর যোগ্য সাংগঠনিক নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগ দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৬ সালে হন দলের সাধারণ সম্পাদক। ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের কারণে দেশরক্ষা আইনে ১৯৬৬ সালের ৮ মে পুনরায় গ্রেফতার হন তাজউদ্দীন। মূলত তার দক্ষ সাংগঠনিক নেতৃত্বগুনেই আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে।

কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিভিন্ন আলোচনার নামে প্রহসন শুরু করে। যাহোক সকল ব্যর্থ আলোচনার ফলাফল যখন অনিবার্যভাবে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছিল তখন বঙ্গবন্ধু পাঁচ জন সদস্যদের একটি দলীয় হাইকমান্ড গঠন করেন। যার অন্যতম ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

gw³ i cv‡Äix n‡q

ঐতিহাসিকভাবেই এ অঞ্চলের মানুষ শোষিত। প্রায় সবকটি মুক্তি আন্দোলনেই বাঙালির ছিল দৃপ্ত পদচারনা। ইংরেজদের 'দু'শ' বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালীদের ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই তরুণ তাজউদ্দীন আহমদ। নেতৃত্বদেন সিলেট রেফারেন্ডামে। অংশ নেন মহান ভাষা আন্দোলনে। সামন্তবাদী দল ত্যাগ করে যোগ দেন এদেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাংখার আশ্রয় আওয়ামী লীগে। আমরা ঔপনিবেশিক শোষনের জঞ্জাল থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা প্রথমেই বাংলা ভাষার কথা বলার দাবী করায় ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী প্রাদেশিক সরকার বাতিল করে। দশ বছরের স্বৈরশাসন ফেরিয়ে সম্ভাবনার সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এক দীর্ঘ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু কেন?

বিষয়টি শান্তিপ্রিয় সকল মানুষের নিকট পরিস্কার । বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট দিয়ে পশ্চিমে গড়ে উঠত ভারী শিল্প কারখানা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর সরকারী চাকরিতে এদেশের জনগণ এক চরম বৈষম্যের শিকার। ঠিক সেই মুহুর্তে আলোচনার কুহেলিকা সৃষ্টি করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার নিরস্ত্র নরনারীর ওপর, শুরু হলো গণহত্য আর বন্দী করল বাংলার বন্ধুকে। পূর্বসিদ্ধান্তনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর তাজউদ্দীন আহমদসহ নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নেতার আত্মগোপন করার কথা ছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু গৃহে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। যা প্রাথমিকভাবে তাজউদ্দীনকে বিমর্ষ করলেও পরবর্তীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ জাতিকে রক্ষায় অনিশ্চিত পথে যাত্রা করেন। সে রাতেই ঢাকাবাসী প্রত্যক্ষ করল এক জিনোসাইড। দেশে চলছে গণহত্যা, বাংলার তাজ চিন্তায়

মগ্ধ কি করে দেশ-জাতিকে রক্ষা করা যায়। তিনি এসেছিলেন এ চরম সংকট মুহূর্তে মুক্তির পাঞ্জেরী হয়ে। ইতিহাস অপেক্ষা করেছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের। হ্যাঁ! তিনি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আস্থার্জন করতে সমর্থ হন। নীপিড়িত জনতাকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তি অর্জনে ভারতের সাহায্য লাভ করেন।

gw³h×, evsjv‡`k Avi ZvRDÏxb Avng`

মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে জীপে করে যাচ্ছে বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদ। স্মৃতির জানালা খুলে ফেলে আসা সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা ভাবতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন নিজ চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করা ঢাকার রাজপথে পাকিস্তানী হন্তারকদের নারকীয়, বীভৎস, খড়গহস্ত। সেই ভয়াল দৃশ্যে অন্তরাঁত্মা কেঁপে উঠতে লাগল। সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে কালভার্টের উপর বসে ভাবতে লাগলেন, কী করা যায়। কর্মশ্রান্ত অবসন্ন শরীর মন বিশ্রাম নিতে চায়। না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি, তিনি ঘুমিয়ে থাকলে সকাল হবে না। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তিনি নিজে যে ধাত্রী। তার ভাষায়, "আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা হলো; একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার কাজ শুরু করা"। না, তিনি সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দেন নি। সন্ধ্যার সময় পাশের ঝোপের ভেতর থেকে ভারি বুটের শব্দ ভেসে এল। তারা গার্ড অফ অনার দিয়ে বলল, "স্যার, ইউ আর ইনভাইটেড টু কাম টু আওয়ার ক্যাম্প"।

তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আইজি গোলোক মজুমদারকে বললেন, "আমরা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয় কেন্দ্রীয় সরকারের রেসপন্স চাই"। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনায় তাজউদ্দীন আহমদ খুব স্পষ্ট করে বললেন, "এটা আমাদের যুদ্ধ। আমরা চাই ভারত এতে জড়াবে না। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে"। দেখুন তিনি কতবেশী স্বাধীনচেতা, সার্বভৌম প্রিয় এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। শ্রীমতি ইন্ধিরাগান্ধী এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আওয়ামী লীগ নেতারা সরকার গঠনের অনুরোধ জানান। দেশের ভেতরে-বাইরে এবং অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ এবং সাহায্য-

সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারিত করবার প্রয়োজনে একটি সরকার গঠন করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। প্রচন্ড দ্বিধা সত্ত্বেও জাতি এবং সময়ের প্রয়োজনে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈদয় নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে দলীয় হাইকমান্ড এর সদস্যদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বদ্যিনাথ তলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে মুজিব নগর সরকার। শত বাধা বিপত্তিকে সামনে নিয়ে এগোতে থাকে প্রবাসী সরকার। গঠন করেন প্রশাসনিক কাঠামো, এমনকি আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, একই সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী। তাই যুদ্ধের সাংগঠনিক পরিকল্পনাও করতে হচ্ছিল তাঁকে। ক্যাবিনেটে তিনি উত্থাপন করেন যে, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে ততদিন আমরা কেউ প্রবাসে পারিবারিক জীবন-যাপন করব না। সবার সম্মতিক্রমে তিনি আট নম্বর থিয়েটার রোডের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পাশে একটি কক্ষে রাত্রী যাপন করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি তার নীতি পরিবর্তন করেন নি যদিও অন্যরা তা রাখতে পারে নি। যুদ্ধকালীন ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা। মুক্তি বাহিনীকে, সাধারণ মানুষকে সাহস জুগিয়েছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল নেতৃত্বের ক্যারিশমা আর তাজউদ্দীন আহমদের ছিলো সাংগঠনিক দক্ষতা। মূলত তাঁর সুনিপুণ দক্ষতার গুণেই যুদ্ধ সঠিক পথে এগোতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পশ্চাতে তাঁর কৌশলগত চিন্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার ভূমিকা খুব বড় ছিলো। যুদ্ধের সময় দলের অভ্যন্তর থেকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তিনি দক্ষতার সাথে সেসব মোকাবেলাও করেছেন। এ সময় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। যুদ্ধকালীন গঠিত সরকারের মাঝেই ছিলো বিভিন্ন বিরোধের ভূত। তিনি সবকিছুকে বিবেচনা করতেন তাঁর নিরীক্ষার দক্ষতা দিয়ে। বুকে ছিলো তাঁর সত্যের সাহস আর মনে ছিলো নেতার প্রতি অবিচল আস্থা। দূরদর্শিতা ছিলো তাঁর অসামান্য। পকিস্তানিরা একটি

সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী। তাদের সাথে লড়াই করার জন্য দরকার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, গোলা-বারুদ। এসব কিছুর ব্যবস্থা করাও সহজ ছিলো না। কিন্তু তিনি সবকিছু মোকাবিলা করেছেন দক্ষতার সাথে। বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন এবং নতুন জন্ম নেয়া বাঙলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতাও চালিয়ে যান তাজউদ্দীন। এমনিভাবে যুদ্ধের সময়ে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনও শরণার্থী শিবিরে, কখনো ভারতীয় মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করে আবার কখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগ্রামী শিল্পীদের সাথে নিয়ে তাঁর যুদ্ধের প্রতিটি দিন কাটতে থাকে। রক্ত ঝরতে থাকে। কান্না ঝরতে থাকে। সে কান্নায় লেখা হতে থাকে আগামীর ইতিহাস। সে ইতিহাসের গাঙচিল হয়ে থাকেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি বুঝেছিলেন এ যুদ্ধের পরিণতি আসন্ন শীতকালের ভেতরই হয়ে যাবে। তাঁর তৎপরতায় সঠিকভাবেই এগোতে থাকে সবকিছু।

ডিসেম্বর' ৭১ এর প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান ভারত আক্রমন করায় ভারতকে যুদ্ধে জড়াতে হলো। রাষ্ট্রনায়ক তাজউদ্দীন ইন্দিরাগান্ধীকে বললেন যে, "ভারতীয় সৈন্য প্রবেশের আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কিভাবে সৈন্য ঢুকবে তার একটা ভিত্তি তৈরী করতে হবে"। তখন চুক্তি হয়, ভারত স্বীকৃতি দেবে আর সৈন্য ঢুকবে যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে। মিত্রবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ফ্রান্সে ঢুকেছিল তখনতো একই রকম চুক্তি তারা করেনি। এমনকি সিডরের সময় আমেরিকান টাস্ক ফোর্স বাংলাদেশে ঢুকল তারা তো চুক্তি ছাড়াই ঢুকেছিল, অথচ ভারতীয় সৈন্য ঢোকার আগেই তিনি এই চুক্তি করেছিলেন। ভারত স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। দিনটি ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ডিসেম্বর শুরুতে ভারতীয় মিত্র বাহিনী যৌথভাবে বাঙালি মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী। যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব নগর সরকারের কতিপয় ষড়যন্ত্রী নেতা পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। পাকিস্তানিদের রসদ সরবরাহে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের পক্ষে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ প্রতিহত করা ছিলো দুস্কর। অবশেষে পাকিস্তানিরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের বিজয় পাখির। ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি

তাজউদ্দীন এক টিভি ভাষণে বলেন- '৩০ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালি রক্তিম বলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি'। তিনি জানতেন তিনি একজন ধাত্রী। আর অভ্যুদিত বাংলাদেশের জনক রয়েছেন শত্রু শিবিরে বন্দি। তিনি কাঁদেন দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায়। মুক্তি দাবি করেন জাতির জনকের।

wele‡¶i Qvqvq

দেশ স্বাধীন হবার পর সম্মিলিতভাবে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এলে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ হন নয়া সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী। ১৯৭৩-এ ঢাকা-২২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এতোদিন যিনি সংগ্রাম করেছেন দেশ স্বাধীনের জন্য এখন তিনি সংগ্রামে নামেন দেশ গঠনের। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থাকে চাঙা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙা করে তুলতে বেগ পেতে হয় তাঁকে। নতুন দেশে নেতা কর্মীদের সাথে দলের, আর জনগণের সাথে সরকারের দূরত্ব বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনের বক্তৃতায় তিনি দল, সরকার এবং নেতা ও কর্মীদের মাঝে দূরত্ব দূর করে, সংগঠন এবং সরকারের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে বিষবৃক্ষরূপী সুবিধাভোগী, দুর্নীতিপরায়ণ, চাটুকার রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের নির্লজ্জ তৎপরতা বেড়েই চলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। তাঁদের মাঝে নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। তাঁদের সুন্দর সম্পর্কে ফাটল ধরে। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে তাজউদ্দীন আহমদকে। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে দেশ প্রেমিক । চাইতেন না কোনোদিনই তাঁকে জড়িয়ে এমন কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হোক যা থেকে জাতির

বৃহত্তর স্বার্থের কোনো ক্ষতি হয়। আর তাই একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতা মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিলেন স্বাধীনতা লাভের মাত্র ২ বছর ১০ মাসের মাথায়। যে নেতা দেশের জন্য পরিবার পরিজন ভুলে গিয়েছেন, ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে নিজ হাতে মৃতদেহ টেনেছেন, ১৯৭১-এ মুক্তি বাহিনীকে সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে একাত্মা থেকেছেন, তাঁকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পদত্যাগ করতে হয়! তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী নেতা। আদর্শই তাঁর কাছে ছিল বড়ো। পদত্যাগেও তাই ব্যক্তি নয়; নীতিগত বিষয়ই ছিলো প্রধান।

wbRb gg¨úkx †e`bv

জীবনের কিছু কাজ কিছু ঘটনা যা মুচে ফেলতে চাইলেও হৃদয় কখনো তা মুচতে দেয় না। কারণ ইতিহাসের কালি বড়ই নির্মোহ। তাজউদ্দীনের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। নেতার অনুপস্থিতে জাতির চরমক্রান্তিলগ্নে হন্ত ারক সাত্রী কাপুরুষদের হিংস্র ছোবল থেকে মাত্র নয় মাসে সফল সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্কল মুক্ত করলেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসল, দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একবারও জানতে চাননি কিভাবে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। এই নয় মাস কিভাবে ছিলে!

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষে তাজউদ্দীন আহমদ জানতে পারেন যে, সেনাবাহিনীর মাঝে একটি দল রয়েছে যারা বঙ্গবন্ধুর প্র িচরম অসন্তুষ্ট। তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিজে গিয়ে সচেতন করেন তাজউদ্দীন। তাঁর আশঙ্কাকে সত্য করে দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এ ভয়াবহ রূঢ়, নৃশংস ঘটনায় সবাই স্তম্ভিত। ঘটনার বীভৎসতায় তিনি আক্ষেপ করে বলেন,"বঙ্গবন্ধু জেনেও গেলেন না তাঁর শত্রু কে আর বন্ধু কে"।

hLb ‡K‡c D‡V AšivZ¥v

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর সবাই তাজউদ্দীন আহমদকে আত্মগোপনে যাবার জন্য বলতে থাকেন। কেননা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে পরবর্তী লক্ষ্য হবেন তাঁর কাছের মানুষরা। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করতে অস্বীকৃতি

জানান। অবশেষে সবার আশঙ্কাই সত্য হয়। ১৫ আগস্ট প্রথম গৃহবন্দী ও পরে ২২ আগস্ট গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি শুধু বলে গেলেন-ধরে নাও আজীবনের জন্য যাচ্ছি । তাজউদ্দীন আহমদ জেলে স্বেচ্ছায় কাঠ কাটেন, ফুল গাছ লাগান; নিজ হাতে কাপড় পরিস্কার করেন, আর রাতে বসে লিখতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক ডায়েরি। স্ত্রীকে তিনি বারবার বলে গেছেন কালো বর্ডার দেয়া লাল মলাটের সেই ডায়েরির কথা। কিন্তু সে ডায়েরি আর বাঙালি জাতির হাতে আসেনি। জাতি বঞ্চিত হয়েছে ধাত্রীর কাছ থেকে দেশের জন্মকথার অনেক অজানা সত্য জানতে। কারাগারে সেনা সদস্যদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। তাঁর কাছে আর কারাগারকে নিরাপদ মনে হয় না। শঙ্কা সত্য হয়।একজন কয়েদি তিনি। কারাগারের নিউ জেল বিল্ডিং ভবনে বন্দি। রাত। প্রতিরাতের মতোই কারাগারের কক্ষে তিনি। বাইরে নিথর থকথকে অন্ধকার।

হঠাৎ খুলে যায় কারাগারের মূল ফটক। চত্বরে প্রবেশ করে কালো পোশাকধারীর নেতৃত্বে অস্ত্রধারী চার জন সৈন্য। বেজে ওঠে পাগলা ঘন্টা। বেজে ওঠে ডিআইজি প্রিজনের টেলিফোন। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে এক দাম্ভিক দানবীয় কণ্ঠস্বর। লেট দ্যাম ডু হোয়াটএভার দে ওয়ান্ট। ডিআইজির হাত ঘুরে জেলারের হাতে ধরিয়ে দেয়া তালিকা অনুযায়ী একই ঘরে সমবেত করা হয় তিন সহযাত্রীসহ তাঁকে। এবার পরিচয়ের পালা।

ইনি....

থমকে যায় বক্তা। পরিচিতির প্রথম শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে গর্জে ওঠে ঘাতকের হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ষাট রাউন্ড গুলির পর সব কিছু স্তব্ধ। মৃত্যুই শুধু যেন নীরবতাকে ধারণ করার স্পর্ধা রাখে। তিন সহযাত্রী নেতাসহ খুন হন, স্বাধীন বাঙলাদেশের ধাত্রী- তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর অস্ত্রের দমকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় চার নেতার জীবন ও শরীর। সে আর এক লজ্জাজনক, বেদনা-বিধুর ঘটনা। নিহত হন বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কান্ডারীরা।

ZvRDÏxb I Zvi A_‰bwZK `kY

আদর্শবাদী হলেও জনাব তাজউদ্দীন ছিলেন বাস্তববাদী। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে দ্বিধা করতেন না। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশ্তেহার ছিল যারা মন্ত্রণালয়ে থাকবে তারা দলীয় পদে থাকবে না। এই কারণে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলে তিনি ক্যাবিনেটে কোন দায়িত্ব নিতে চান নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একান্ত ইচ্ছায় তিনি অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ । কেননা তারা যে বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতেই সংগাম করেছে, সে দিক থেকে এটি আরেক মুক্তিযুদ্ধ। দূরদর্শী তাজউদ্দীনের দৃষ্টিতে "মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ১৬ই ডিসেম্বর শেষ হয়ে যায়নি"। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই মানুষের দুঃখকষ্টের অবসান হয়না। এজন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া নির্ভর করে নির্ভুল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়াম্যান প্রফেসর নরুল ইসলাম লিখেছেন "আমরা একবার ভারতে গেলাম একটা ডেলিগেশন নিয়ে। আর এদিকে এনায়েতউল্লা খান হলিডেতে হেডলাইন দিয়ে লিখে ফেললেন, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন গেছে ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে আসতে এবং প্ল্যান তৈরী করার আগে দিক নির্দেশনা নিতে। আমাদের মনোভাব ছিল, আমরা স্বাধীন দেশ, কথাবার্তায় আমরা স্বাধীনতার কথা বলব। দেশের স্বার্থে বিষয়ে কোন খাতির নেই। জনাব তাজউদ্দীনের কথা ছিল, বিপদে সাহায্য করেছ ভাল কথা, আমরা বন্ধু থাকব কিন্তু তাই বলে আমার দেশের স্বার্থের ক্ষতি হয় এমন কোন সুবিধা আমি তোমাকে দেবনা"। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ জাতীয়করণ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে আসে প্রায় চার পঞ্চামাংশ পুঁজি। এর মধ্যে পুরো রেল ব্যবস্থা, বিমান ব্যবস্থা, নৌ চলাচল ব্যবস্থা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনার নয় দশমাংশ। তখন অর্থনীতি পুনর্গঠন ও বিকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশী এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি

বলেন, "আমাদের গড়ে সাতকোটি মানুষের মধ্যে ভূমিহীন ও পাঁচ একরের কম জমি আছে এমন কৃষকই হলো ৭৮ শতাংশ। প্রায় (দুই) কোনটি মানুষ পরিবার পরিজনসহ একেবারেই নিঃস্ব, আরও ৩ (তিন) কোটি কৃষক কি করে দিন চালাবে তা জানেনা। দুই পঞ্চমাংশ কৃষকের হালের বলদ নেই। এই দুই ক্যাটাগরির মানুষ স্থানীয় ধনী কৃষকদের জমিতে কাজ করে। ফসলের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশই তারা জমির মালিককে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের কৃষিভূমি দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রতিবছর ১ (এক) কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়। আমদানী করতে হয় ১১০ থেকে ১১৫ লক্ষ টন চাল। শোষন ও যুদ্ধের ফলে কৃষির অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনায় আমরা চাইছি কৃষকদের অবস্থা ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে। একবারেই তো আড়ষ্ট কঠিন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এজন্য দরকার দীর্ঘ সময়"।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো এবং অর্থনীতি পুনর্গঠনে বিশ্বের অনেক দেশ যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে। তখন আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য শর্তসাপেক্ষ কিছু সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে একজন প্রতিনিধি জনাব তাজউদ্দিনের সাথে দেখা করেন। তখন তিনি স্পষ্টভাবে তাকে বলেছিলেন, ভিক্ষুকদের বেচে নেয়ার বা পছন্দ করার কোন সুযোগ থাকেনা। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষ, যারা রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা তো ভিক্ষুক নই। তাই কোন শর্তসাপেক্ষ কারো সাহায্য নিতে আমরা ইচ্ছুক নই। এ ধরনের দৃঢ় মনোবল বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোন রাষ্ট্র নায়কের ক্ষেত্রে আজও লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাধীনতার পর ৭২ এর জানুয়ারীতে সরকারী কোষাগার ছিল ফাঁকা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূণ্য কিন্তু '৭২ এর সেপ্টেম্বর' অর্থাৎ ৯ মাসের মধ্যেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়াল শূন্য থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলারে। আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী এই রিজার্ভ ছিল সন্তোষ জনক। এই অবস্থায় আই এম এফের ঋন নেব কিনা প্রশ্ন উঠলো বাস্তবাদী তাজউদ্দীন ঘোষণা করেলন, "সম্পূর্ণ শর্তহীন ভাবে হলে এই ঋণ আমরা নেব"। অর্থনীতিতে তাঁর

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার ৪১ বছর পর আজ যখন বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র তৈরী করার আমাদের দক্ষ কোন কর্মী নাই, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দেশে এলে বিনিয়োগের শর্তগুলো দেশের স্বার্থের অনূকুলে তৈরী করার মতে যোগ্য লোক নেই। অভিযোগ করা হয় আমেরিকা, ভারত, বিশ্ব ব্যাংক আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তখন মনে পড়ে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন পরিকল্পিতভাবে দেশের কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন স্টেটিসটিক্যাল বুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্ল্যানিং সেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই আজ দেশকে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের কৃষক, শ্রমিক জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা মাথায় রেখে তাজউদ্দীনের মত একজন অর্থমন্ত্রীর চিন্তাধারার বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। যিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী এবং দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে।

mkvm‡bi cvZvq

সুশাসন নিশ্চিতকরন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এককথায় মানব উন্নয়ন একবিংশ শতাব্দীতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে। যা নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, একটু বুঝিয়ে বললে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য অনেক বেশিই কষ্টকর। একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি অর্থ্যাৎ সুশাসন নিশ্চিত করা। সুশাসন বলতে এটি আইনের শাসন ভিত্তিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, দায়বদ্ধ এবং সর্বতোভাবে দলীয়করণ মুক্ত একটি শাসন ব্যবস্থা। মূলত এটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার একটি পথ যা সরকার দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্টানের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। দেশের একজন দিনমজুর থেকে শুরু করে উচ্চ প্রদস্ত কর্মকর্তা সকলেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। উপরোক্ত তিনটি কথাই যথাক্রমে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক এবং ইউএনডিপির সু-শাসনের ধারনার সংক্ষিপ্ত রূপ। বিশ্বায়নের এ যুগে- সচেতন নাগরিক সমাজ চেষ্টা করেন তাদের বর্তমান রাষ্টকাঠামোটি আসলে এসব শর্তের কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে। জনাব তাজউদ্দীন ছোটবেলা থেকেই

অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। প্রচুর পড়াশোনা করতেন ইতিহাস, সমাজ এবং সমকালীন বিশ্ব সম্বন্ধে। বিকেলে এসে শীতলক্ষ্যার তীরে পানিরাশির কলকল করে বয়ে যাওয়ার স্নিগ্ধতায় দক্ষিণা বাতাসের স্পর্শে নিজেকে শানিত করে নিতেন। প্রকৃতির এ দীক্ষা আর বিপ্লবীদের রেখা যাওয়া আশির্বাদ তাকে সমাজের প্রতি আরো বেশী দায়বদ্ধ করেছিল। জীবনের প্রথম ধাপেই মুসলিম লীগের রাজনীতি তাকে করেছির অধিকার সচেতন। যে অধিকার বলেই তিনি এ দলের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা আঁচ করতে পেরে আওয়ামী লীগ গঠনে উদ্যোগী হন। কাপাসিয়ার শৈশব, কৈশর জীবনে সর্বসাধারণের কাছাকাছি অবস্থানের ফলে তিনি নীপিড়িত জনতার দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে বোধগম্যতা অর্জন করেন। যা তাকে আরো বেশী দুর্নীতিমুক্ত আর সংবেদনশীল হয়ে ওঠতে সয়াহয়তা করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুর্নীতি থেকে অনেক বেশী দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। আইনের শাসনের প্রতি তাঁরছিল পূর্ণ শ্রদ্ধা। তিনি কখনো দলীয় করনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাইতো তিনি চাননি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী সভায় না থাকতে যা ছিল সত্তরের নির্বাচনের ইশতেহার।

যুদ্ধের সময়ে "মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত ইয়ুথ ক্যাম্পের মাধ্যমে। এটি বিশেষ রাজনৈতিক দল থেকে নেয়া হত। যে যুবকটি এদেশের জন্য যুদ্ধ করতে চায় তাকেও সাহায্য করা উচিত যাতে সে যুদ্ধ করতে পারে। এটাতো ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়, দলীয় যুদ্ধও নয়। এটা জাতীয় যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে বোঝানোর পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ মত দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য দল থেকেও ট্রেনিং দেয়ার জন্য ছাত্র-যুবক নেয়া হবে। এটা অনুমোদন করতে গিয়ে তিনি বেশ প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিলেন"। তিনি বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনাব তাজউদ্দীন ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুজিব নগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। এতে মওলানা ভাসানী, কমরেড মনিসিং, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবন্দ ছিলেন। এসব সংগঠনসহ ছাত্রইউনিয়নের কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণসহ অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলো। উপদেষ্টাদের কমরেড মনিসিং বিপ্লবী ইলা মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। বিশ্বশান্তি পরিষদ সম্মেলনে

ন্যাপনেতা দেওয়ান মাহবুব আলী বুদাপেষ্টে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম প্রত্যক্ষ করলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, এগুলো কি হচ্ছে? অর্থ্যাৎ তিনি স্বচ্ছাতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি করে কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনা। সকল রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত করে ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রবর্তন করা হয়, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই এটাকে মেনে নিতে পারেন নি। কেননা তিনি জনগণের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাসে করতেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতায়, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি মূলক শাসন ব্যবস্থায়। কিন্তু এগুলো তিনি বাকশালে খুঁজে পাননি বলেই খুশি হতে পারেন নি। যার পুরস্কার স্বরূপ তিনি মন্ত্রীসভা থেকে বহিস্কার হন। মূলত আইনের শাসনের প্রতি অবিচলতা তাকে ক্যাবিনেটে জনগনের পক্ষে কাজ করতে না দিলেও ইতিহাস তাকে মহিমান্বিত করেছে। এদিকে থেকে সুশাসন আর তাজউদ্দীন আহমদ মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ।

B‖Znv‡mi mv¶x

মানুষের কর্মই মানুষকে ইতিহাসে চির অমর করে রাখে। ১৯৭৫ সালে ৩ নবেম্বর এ মহান তারকা বাংলার আকাশে যবনিকাপাত ঘটলেও ইতিহাস অনন্তকালে ধরে এ মহান আদর্শকে লালন করে যাবে। একজন ব্যক্তি কতদিক থেকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ তাজউদ্দীন আহমদ। এটি খুবই বিস্ময়কর, এ মহান ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক পরিবারেও জন্ম গ্রহণ করেন নি, আর না কোন সরকারী উচ্চপদস্ত কর্মচারীর আবাসে। কিসে তাকে এত মানবিক করে তুলে ছিল তা আজও ইতিহাসের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়। সেই ছোট্ট বেলাটিতে যখন গ্রামে ডায়রিয়া দেখা দেয়। তারা প্রচন্ড খাদ্যাভাবে ভুগছিল, ঢাকায় পড়ুয়া একজন ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাকে বললেন "তুমি রান্না করে দাও আমি তাদের খাবার দিয়ে আসব"। এবং ব্রিটিশ আমলে খাজনা না দেয়ায় কিছু জমি তার বাবা ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেন তাদের সন্তানরা বড় হলে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, স্বৈরাচার হটাও আন্দোলন, ছয় দফা প্রণয়নে, গোলটেবিলে বক্তব্য তৈরীতে, নির্বাচনী ইশতেহার রচনায় আর অসহযোগ আন্দোলনের নীতিমালা প্রণয়নে তিনিই ছিলেন অগ্রপথিক এবং বঙ্গবন্ধুর

দক্ষিণ হস্ত। জাতির সামনে মহা দুর্যোগের মুহূর্তে পরম নির্ভর বন্ধুর হাতে ধরে বঙ্গবন্ধু বলেলেন, "তুমি সরে পড় তুমি পারবে"। পৌরাণিক কাহিনী "মহাভারতে আছে, রামের খড়ম সিংহাসনে রেখে ভারত রামের পক্ষে দেশ শাসন করেছিলেন যা বাংলাদেশে তাজউদ্দীনের ক্ষেত্রে সত্য"। ইতিহাসে যেকোন জাতি তার লক্ষ্য আদর্শ ও স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হলে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা সেই মহতী লক্ষ্য বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়। পাকিস্তানের শোষন-বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালী জাতি বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যা সফলতায় রূপদান করেন তাজউদ্দীন আহমদ।

আর স্বাধিকার সংগ্রাম যদি সশস্ত্র হয় এবং অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিতে হয় তাহলে সুদক্ষ, দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত গুনাবলি সম্পন্ন নেতৃত্ব ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়। এ ধরনের নেতৃত্বে প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম এবং অফুরন্ত প্রাণ শক্তি নিয়ে বের হয়ে আসতে হয়। ইতিহাসের শিক্ষায় সমৃদ্ধ এবং জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাকে হতে হয় পারদর্শী। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতার পাশে এক বা একাধিক স্থিতধী, তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবাদী নেতার সমাবেশ ঘটে। যেমন জর্জ ওয়াশিংটনের (১৭৩২-১৭৯৯) সহায়ক তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে টমাস জেফার্সন (১৭৪৩-১৮২৬) অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। সকলকে অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধুর (১৯২০-১৯৭৫) নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠেন প্রধান প্রতিষ্ঠান। তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) তার প্রধান সহযোগী হিসেবে যাবতীয় নীতি পরিকল্পনায় হয়ে ওঠেন প্রধান ব্যক্তি। যার সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যা সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল তা হলো বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব। জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিএসএফ কর্মকর্তা গোলোক মজুমদারকে মজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের শেষে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "এক আম্রকাননে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, আজ নতুন করে আবার স্বাধীনতার সূর্য উদিত হল সেই আম্রকাননেই"। যা ছিল প্রাজ্ঞ আর দূরদর্শী নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। শান্ত, ধীরস্থির, অন্তর্মুখী তাজউদ্দনি মঞ্চে উঠে জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার চাইতে কর্মী

সভায় আলাপচারীতাকে গুরুত্ব দিতেন। প্রজ্ঞা, মেধা ও যুক্তিবাদীতায় হয়ে উঠতেন সকলের মধ্যমনি। তবে ব্যক্তি হিসেবে ছিল না সামান্যতম অহংকারবোধ। অন্যায় অযৌক্তিক আবদার নিয়ে কেউ তার নিকট আসার সাহস করত না। তিনি প্রতিশ্রুতি খুবই ভক্তিভরে মূল্যায়ন করতেন। যেমন- দেশ থেকে চলে আসার সময় পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পেরে শুধু একট চিরকুট পাঠিয়ে ছিলেন স্ত্রীকে- "সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও, দেখা হবে মুক্তির পর....."।

অসুস্থ সন্তান নিয়ে যখন কয়েক মাস পরে তার স্ত্রী ভারতে পৌছেন তিনি মাত্র সাত মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্বরূপ তাদের সাথে রাত্রীযাপন থেকে বিরত থাকেন। এরকম জ্ঞানী, সৎ ও জনদরদী মানুষ আজকের সমাজে বিরল। এত গুনে গুনান্বিত থাকার পরেও তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্ম প্রচার বিমুখ। তিনি বলতেন, আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি ভবিষ্যতে যখন ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন আমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। তিনি নির্দ্বিধায় বলতেন, "মুছে যাবে আমার নাম, তবু বেঁছে থাক বাংলাদেশ"। সর্বোপরি আত্মপ্রচারবিমুখ এ মানবটি অনেকটা নেপথ্যে থাকার চেষ্টা করতেন। প্রখ্যাত শিখ্যাবিদ, গবেষক অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ঠিকই বলেছিলেন, "তাজউদ্দীন আহমদ তার সময়ের অনেক পূর্বেই পৃথিবীতে চলে এসেছেন, তাকে জানতে এখনোও অনেক বাকী রয়ে গেছে"। তার জীবন, কর্ম, চিন্তা-চেতনা, নেতৃত্ব, ব্যাক্তিত্ববোধ ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে রইল। যার সত্যিকারের অনুসরণ জাতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করবে।

Z_¨mÎ:

১. আত্মকথা '৭১' নির্মলেন্দু গুণ ।
২. 'আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ', সিমিন হোসেন রিমি ।
৩. 'আলোকের অনন্তধারা সিমিন হোসেন রিমি ।
৪. 'ইতিহাসের পাতা থেকে ' সিমিন হোসেন রিমি ।
৫. 'তিন নভেম্বর জেলের পাগলা ' ঘন্টা এ্যাড. মোখলেসুর রহমান ।
৬. 'দু'শো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা' মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নুরুল কাদির ।
৭. দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান লে. জে. এ. কে. নিয়াজী ।
৮. 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', আবু সাঈদ চৌধুরী ।
৯. 'পলাশী প্রান্তর থেকে বাংলাদেশ' খুরশীদ আলম সাগর ।
১০.তাজউদ্দীন আহমদ, রাজিত আলম পুলক
১১. তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রী ।
১২. জাতীয় চার নেতা স্মারক গ্রন্থ ।
১৩. বাংলাপিডিয়া ।
১৪. বাংলাদেশ সরকার, গণসংযোগ বিভাগ ।
১৫. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
১৬. মূলধারা '৭১' মঈদুল হাসান ।
১৭ তাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশ অভ্যুদয় এবং তাজউদ্দীন আহমদ', কামাল হোসেন ।.
১৮. আলীম উদ্দীন, প্রগ্রেসিম ফোরাম, ইউএসএ (২০০৬) ।
১৯. সিমিন হোসেন রিমির সাক্ষাৎকার ।
২০. পাঠচক্র রিভিউ, তাজউদ্দীন আহমদ, পাঠচক্র (১১, ১২).

Z_¨wPÎ

তাজউদ্দীন আহমদ: নিঃসঙ্গ সারথি, তানভীর মোকাম্মেল, ভিডিও চিত্র (২০০৭) ।

I‡qe mÎ

http://www.tajuddinahmad.com/newsevents.htm
www.tajuddinahmad.com/peoples_taj/atiurrahman.pdf
www.tajuddinahmad.com/peoplestaj.htm
http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/A_0121.HTM
http://www.library.shuchinta.com/tajuddinSpeechApr1171.pdf
http://www.gunijan.org
http://www.somewhereinblog.net/blog/shobdoshoily/28982683
http://muktadhara.net/page10.html
http://www.photographersdirect.com
http://www.tajuddinahmad.com/tajuddinslife.htm
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=147829
http://www.thedailystar.net/magazine/2010/11/02/book.htm
http://www.somewhereinblog.net/blog/fix/29133816
http://blog.bdnews24.com/scmyblog7/27877
(All website have been searched on 18 June, 2012)

^`wbK cwÎKv

The Daily star (Thursday, July 23, 2009, Friday, July 23, 2010).